জীবনানন্দের কবিতায় গল্প-সংলাপ-নাট্যধর্মিতা

ড. শিবশঙ্কর পাল

‘সেই গল্প কারো মনে নাই?’

জীবনানন্দ কবি কথাসাহিত্যিক গল্পকার। আবার তাঁর উপন্যাস গল্পে প্রবেশ করলে সহজেই পাওয়া যায় এক কবিমন। বিপরীতক্রমে কবিতায় গল্পের আমেজ বা আভাসটাও ধরা যায়। কবি, লাবণ্য দাশকে বলেছিলেন তাঁর কবিসত্তার আড়ালে উপন্যাসগুলি চাপা পড়ে যাবে। যদিও তা মৃত্যুর পরে জনসমক্ষে বেরিয়ে এসেছিল। তথাপি কবিতার অন্তরে কাহিনি গল্পের অনেক টুকরো অবতংশ রেখে ছিলেন কবি। সেখানে যেমন প্রাচীন মিশরের টুকরো কাহিনি, বাংলার লোক উৎসবের খণ্ড খণ্ড ছবি আছে তেমনি আছে ব্যক্তিক জীবনের নানা সম্পর্কের খতিয়ান, তার গল্প। তবে সবই কবিতার শব্দে এমন করে আত্মসাৎ করা আছে; তাকে অন্বেষণ করতে গেলে কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। অনুমান ধারণার সঙ্গে কবির জীবনের ওঠানামা মিলিয়ে দেখলে সেসব কথাকে অমূলক মনে হবে না। যেমন সুবিনয় মুস্তফী, অনুপম ত্রিবেদী, লোকেন বোসের জার্নাল প্রভৃতি কবিতায় আমাদের মনে হয় কবির সঙ্গে তাদের ব্যক্তিক সম্পর্ক ছিল। এই সুবিনয় মুস্তফী কে? যে ভুয়োদর্শী যুবকটা ইঁদুর-বেড়ালের খেলা দেখাতে পারত? কে ওই অনুপম ত্রিবেদী যার কথা মৃত জীবিত পৃথিবীর ভিড়ে কবির মনে পড়েছে? সুজাতাকে ভালবাসত সেই লোকেন বোস কে? জীবনের কোনও এক খাতে হয়তো তাদের সঙ্গে কবির পরিচয় হয়েছিল, যারা কবিতায় এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ তাদের গল্পটি আঁচ করা যায়। তারা কল্পনায় এলেও বাস্তবের ভূমির সঙ্গে তাদের যোগ পাওয়া যাচ্ছে— উত্তরপাড়া, ব্যান্ডেল, বেহালা তার পরিচায়ক। লোকেন বোসের জার্নালে আসছে বারো তেরো কুড়ি বছর আগে লেখা পুরনো চিঠির কথা।

স্মৃতি অভিজ্ঞতা কল্পনার মিশ্রণে কবিতার উৎপত্তি, একথা অস্বীকার করা যায় না। জীবন প্রকৃতিবোধের আলোকে কবি যে সব কথা বলেন তাও তো এই মাটি আকাশ গাছের গল্প। রূপসী বাংলার মাঠের গল্প। একা প্রকৃতি ও একা কবির আন্তঃসম্পর্কের লেনদেন সেসব। বাকবিভূতির আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় জীবনানন্দ যে ছবি আঁকেন, বুনে দেন জীবনের স্বাদ তার বিবরণ গল্পকেও স্পর্শ করে যায়। সেকারণে কবিতার নাম রাখছেন ‘মাঠের গল্প’—

“তাদের মাটির গল্প—তাদের মাঠের গল্প সব শেষ হলে

অনেক তবুও থাকে বাকি,—” (মাঠের গল্প) এ কবিতা তো মেঠো চাঁদ, পেঁচা, পোড়ো জমি নিয়ে মাঠের ফসলের গল্প। ফসল বোনা, ফসল কাটা, তারপর শূন্য মাঠে অঘ্রাণের মাঠে যে পাখি জেগে থাকে সে তো কবির সঙ্গে আত্মলীন। ‘সুন্দরবনের গল্প’ কবিতায় এসেছে হরিণ ও চিতা বাঘিনীর গল্প, বনের রঙের বাহার, আবার সেখানে রাখা আছে রূপক। বলতে গেলে জীবনানন্দের কোনও কবিতায় গল্পের

স্থানকালপাত্রের সুসামঞ্জস্য অবস্থান নেই। নেই তাদের পরিপূর্ণ বিকাশ। যা আছে তা কাব্যের শ্রীমণ্ডিত গল্পাংশ। যদি তা না থাকত কেন কবিতার নামকরণে 'গল্প' শব্দের অবস্থান? যেখানে বিষয়কে রূপকের মোড়কে তুলে ধরার, কিছুটা গল্পের ধাঁচে শব্দ বোনার অভিপ্রায় আমাদের ভাবিয়ে তোলে। 'সোনালি সিংহের গল্প' আসলে তো সমাজের সেইসব মানুষের গল্প যারা আমাদের শস্য 'বেহাত করে ফেলে সব।' সেখানে কিছুটা যে হেঁয়ালি আছে সে কথা স্বয়ং কবিই বলে দিলেন 'যদি না সূর্যাস্তে ফের হয়ে যায় সোনালী হেঁয়ালি।'

কবিপত্নী লাবণ্য দাশ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি যে কাব্যলোক প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন; তাতে প্রতিষ্ঠা বা কবিতাকে নতুন পথের দিশারি করে তোলা সে সময়ে সহজ ছিল না। তাই গল্প লেখার দিকেও ঝুঁকেছিলেন কবি। লিখেও ছিলেন। লাবণ্য দেবীর মতে এবং আমাদেরও মনে হয় কবিতা গল্প বা উপন্যাসের মাঝে জীবনানন্দ পৃথক সত্তা নিয়ে উপস্থিত হতে পারেননি। গল্প উপন্যাসে কবির আওয়াজ বারবার মনে করিয়ে দেয় জীবনানন্দ মূলত কবি। গল্প বা উপন্যাসে ঠাঁসবুনট, কাহিনি-উপকাহিনির নানান উপকরণ নেই। নেই ঘটনার ক্রমান্বয়ী ঘনঘটা। নেই রোমাঞ্চ বা বিচ্ছেদের ধস্তাধস্তি। কিন্তু কবির মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় অবশ্যই আছে। যেমন তাঁর কবিতায় কোনও কিছুর একমুখী বা এককেন্দ্রিক বিস্তার নেই। তা বিভিন্ন অভিমুখ বিভিন্ন ভাবলোকের সমন্বয়। যদিও ব্যতিক্রম আছে তথাপি তাঁর অধিকাংশ কবিতায় বহু দিক খুঁজে পাওয়া যায়। অর্থাৎ গল্পের মাঝে কবিতার বা কবিতায় গল্পের সামপতন আশ্চর্যের বিষয় নয়। ধরা যাক বহুচর্চিত 'বনলতা সেন' কবিতা। সেখানে তিনি যে পাণ্ডুলিপির আয়োজন করলেন তা—

'গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;' করে উঠল। সেটা এক পথভ্রমণ ক্লান্ত বা ইতিহাসচারী প্রেমিকের কথা হয়ে উঠল। এই যে প্রেমের গল্প সেখানে প্রেমিকাও কণ্ঠস্বর নিয়ে জেগে উঠল— 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এই জিজ্ঞাসা আমাদেরও। বনলতা সেনের ভিতরে কি কোনো পুরনো গল্প লুকানো আছে। দাম্পত্য জীবনে অসুখী প্রেমহারা জীবনানন্দের জীবন গল্প কি এখানে নেই? জীবনানন্দ গবেষক ভূমেন্দ্র গুহ বনলতার মাঝে কবির পুরনো বা হারানো প্রেমিকাকে দেখেছেন। ওই পুরনো বা প্রাচীন প্রেমিকা কি কবির কাছে হাজার হাজার বছরের চিরন্তনতা নিয়ে উপস্থিত হল। তাই কি কবি হাজার বছর ধরে প্রাচীন স্থানে অন্বেষণ করলেন? তাকেই কি খুজে পেলেন গ্রাম বাংলার প্রান্তে। যখন সে অন্বেষণ শেষ হল তখন বললেন জীবনের আর কোনো লেনদেন নেই। তবুও বাস্তব জীবনে হারিয়ে ফেলা প্রেমিকার স্মরণে সৃজন করলেন অন্ধকার— 'থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।' বাস্তবের সঙ্গে এ কবিতায় লুকিয়ে রাখা গল্পকে আমরা একেবারে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি না। আবার আমাদের এও মনে হয় এই কবিতার গল্পে যেন প্রকৃতি রমণী প্রেমবাদের প্রতীক হয়ে ফিরে এসেছে। বনলতা যেন গ্রামবাংলার লতাবিতানের প্রতীক। সেন পদবি যোগ করে তাকে মানবী করা হল যেন। এটাও হতে পারে কবি যে প্রকৃতির অন্বেষণ করছিলেন, সেই প্রকৃতির সন্ধান মিলল বাংলার পাখির নীড়ে, সন্ধ্যাকাশে, শিশিরের জলে। কবিতাটিতে আমাদের মনে হয় সময়ের গল্পও নিহিত হয়ে আছে। এখানে যে হালভাঙা দিশাহারা নাবিক, 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক,'-এর উচ্চারণ সেখানে সময়কে বুঝে নেওয়া যায়। বনলতা সেন কবিতাটি প্রকাশকালে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পালাবদলের প্রচেষ্টা, রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির অভিপ্রায়, কল্লোলের অভিযাত্রা, দেশীয় আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা, আন্তর্জাতিক ফরাসি ও নাৎসিবাদের বিকাশ; সর্বোপরি জীবনানন্দের ব্যক্তিক পথ অন্বেষণ, তাতে দু'দণ্ড শান্তি কামনার গল্প ডুবে থাকা অসম্ভব নয়!

সুরঞ্জনা, অরুণিমা, শেফালিকা প্রভৃতি মানবীর উল্লেখ কি হারানো প্রেমের গল্পে পুষ্ট? যতই সেখানে কবির চেতনালোক জেগে উঠুক না কেন! সেই বোধ কি তাঁকে সর্বদা তাড়া করেছিল? তাই কি বোধ কবিতায় বলছেন—

‘‘ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে...

আমারে সে ভালোবাসিয়াছে,

আসিয়াছে কাছে,

উপেক্ষা সে করেছে আমারে,

ঘৃণা ক’রে চ’লে গেছে— যখন ডেকেছি বারে-বারে

ভালোবেসে তারে;’’ — এই কথার স্বর আমরা পাচ্ছি তাঁর ‘সঙ্গ, নিঃসঙ্গ’ গল্পে—

‘‘কেনোদিন কাহাকেও ভালোবাসিয়াছিলাম, হারাইয়া ফেলিয়াছি— একি তাহারই হ্লাদিনী?..অনন্ত অপরিসীমের দিকে চলিতে-চলিতে নারিকেলের পাতায়, চিলের ধবল গলায় খয়েরি ডানায়, ভোরের নৌকার রঙিন পালে, খর রৌদ্রে, মেঘনা-ধলেশ্বরীর স্ফীত স্তনের বন্যায়, মধুকূপী ঘাসে, কাশের সমুদ্রে, দ্রোণফুলের ভিড়ে, মৃতা রূপসীর ললাটের সিন্দুরে, গোধুলির মেঘে, শীতসন্ধ্যায় কুয়াশায়, স্থবিরের বিষণ্ন চোখের নির্জন স্বপ্নতন্তুর ভিতর, তাহারা যে সুর বাজাইয়া যায়— এ শুধু তাহারই ধ্বনি।’’ জীবনানন্দের হাতে কবিতা ও গল্প কখন যেন এক হয়ে যায়।

জীবনানন্দ কবিতার যে বিস্তার ঘটান, সেখানে মননের অভিক্ষেপ থাকলেও তা কখনই সময় বহির্ভূত নয়। মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা কাব্যগুলিতে সময়ের অবস্থান অনেকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সময়জাত নানা গল্প-কথা স্বাভাবিক কারণে সেখানে চলে আসে— ‘গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব / অর্থবিহীন হয়ে গেলে, —তবুও আর এক নবীনতর ভোরে সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ’ (যতিহীন) পথ চলে। সেখানের গল্প-কথার আভাসে কিছুটা আশাবাদও থেকে থেকে জেগে ওঠে। কবিতার কথায় চলে আসে সমস্ত মহাদেশ ব্যাপী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির কথা। সময়চিহ্নিত কবিতায় থাকে সময়ের ছাপ। চলে আসে জনসাধারণ। আমরা যদি ‘এই সব দিনরাত্রি’, ১৯৪৬-৪৭ প্রভৃতি কবিতাগুলি দেখি তাহলে দেখব সেখানে ইয়াসিন মকবুলরা আছে। আছে দাঙ্গা ও দেশভাগজনিত মানুষের বিব্রতার গল্পকথা। তবে তা আভাসে বর্ণিত। গল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপ কবিতায় আশা করাও যায় না। আবার কবিতায় সেসব দিনের গল্পকে এড়িয়েও যাওয়া যায় না। সমাজ সময়ের যান্ত্রিকতা নিয়ে অজস্র মানুষের কথা তুলে ধরছেন জীবনানন্দ। শুধু প্রেম নয়, শুধু মৃত্যু নয়, জীবন যুদ্ধে সামিল গণরা সেখানে এসে দাঁড়াচ্ছে—

‘‘অনেক শ্রমিক আছে এইখানে।

আরো ঢের লোক আছে

সঠিক শ্রমিক নয় তারা।

স্বাভাবিক মধ্যশ্রেণী নিম্নশ্রেণী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরিধি থেকে ঝরে

এরা তবু মৃত নয় ; অন্তবিহীন কাল মৃতবৎ ঘোরে।'' (এই সব দিনরাত্রি) এদের মাঝে আমরা কি তাদের জীবনযাপনের গল্পকথা অনুভব করতে পারি না? এদের ভাবনায় কি কবি বলছেন না— 'এসো মানুষ, আবার দেখা যাক / সময় দেশ ও সন্ততির কি লাভ হতে পারে।' (শতাব্দী) কবিতার মাঝে কবি কখনও ফিরে যান ইতিহাসের গল্পে। 'মিশর', 'পিরামিড' প্রভৃতি কবিতা-গল্পে। চিরকালের ইতিহাসকে সামনে রেখে লেখক যে কথা বলেন, তা তো ইতিহাস থেকে বর্তমানের সারাংশ বা গল্পালাপ—

''একে-একে ডুবে যায় দেশ, জাতি,—সংসার, সমাজ,

কার লাগি হে সমাধি, তুমি একা বসে আছো আজ

কী এক বিক্ষুব্ধ প্রেতকায়ার মতন!'' (পিরামিড) কখনও 'লঘু মুহূর্ত'-এ তিনজন ভিখিরির গল্প বলছেন। 'জুহু' কবিতায় রাখলেন সোমেন পালিত সম্পর্কিত গল্প। 'সামান্য মানুষ' কবিতার তুলে ধরলেন ছিপ-হাতের এক সামান্য মানুষকে। জীবনানন্দের কবিতায় গল্পের যে সব টুকরো ছবি তা সম্পূর্ণ না হলেও ইঙ্গিতবাহী। কোনও পরিপ্রেক্ষিতে বা পরিস্থিতিতে তিনি কবিতা লিখছেন সেটাও আমরা অনুমান করতে পারি। তাঁর গল্প বা উপন্যাসে আমরা যেমন থেকে থেকে কবিতার স্বাদ পাই, তেমনি কবিতায় গল্পের আভাস পাওয়া যায়। যেমন সমারূঢ় বা কবি প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক কবিতার প্রেক্ষাপট আমরা অনুমান করতে পারি। প্রথাবিরুদ্ধ হয়ে সেখানে সমালোচকদের কাছে তার বিরোধের আঁচ অনুমান করা যায়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা দেখি তাহলে বুঝতে পারি বরিশালের শ্মশান বা লাসকাটা ঘর সম্বন্ধীয় কবির পূর্ব অভিজ্ঞতা সেখানে মিশে আছে। 'শব' গল্পে কবি রাখলেন রঙের খেলা। তার শেষে মৃণালিনী ঘোষালের মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধীয় গল্পটিকে রঙের পোঁচে রাখলেন লুকিয়ে।

সংলাপ কবিতারও আধার। এই কথনভঙ্গিতে কখনও কবি নিজে নিজের ভিতর বাহিরের সঙ্গে আলাপে, আত্মউন্মোচনে লিপ্ত হন। কখনও সেই সংলাপে আমি তুমি আমাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। কবির আমি আমাদের সকলের প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। তুমির মাঝে থাকে জগত প্রকৃতি আপামর মানুষ। তবুও অধিকাংশ কবিতায় কবি কেন সংলাপরীতি ব্যবহার করছেন সেটাও জানা দরকার। সংলাপের মাধ্যমে বক্তব্যের ভার যেমন অনেকটা পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি সংলাপ থাকলে আমাদের উপস্থিতিও মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। সংলাপের হাত ধরে বিষয় থেকে ভাবের আদানপ্রদান অনেকটা সহজ হয়ে যায়। আবার বলতে গেলে কবিতাও একপ্রকার সংলাপ। শুধু তার গঠনভঙ্গি কথনশৈলী কথাসাহিত্য থেকে কিছুটা আলাদা। তাঁর বহু কবিতায় উদ্ধৃতিসহ সংলাপ আছে। কবি সেই সংলাপের মধ্যে নিজের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। যেখানে নিজের অনুভূতি অন্য চরিত্রের মাঝে আত্মগোপন করে। যেমন 'সে', 'কী যেন কখন আমি অন্ধকারে', 'আমার এ ছোটো মেয়ে' প্রভৃতি কবিতার যে সংলাপধর্মিতা সেখানে কবির সঙ্গে যারা সংলাপে অংশ নিচ্ছে তারা কবিরই অন্তর বা অনুভবের কথা। কখনও অন্যদের

আবছা অবস্থান। সে কবিতায় কবিকে যে ডেকে নিল, সে কে? সে কি কবির অনুভূতি নয়! আবার পুরো একটা সংলাপের উপর দাঁড়িয়ে 'কে এসে যেন' কবিতায় যে বাতি জ্বালিয়ে দিল তা কি কবির চেতনা নয়!—

"কে এসে যেন অন্ধকারে জ্বালিয়ে দিল বাতি,

বললে, 'আমার অপার আকাশবলয় থেকে স্বাতী

তোমার ঘরে এসেছে আজ নেমে;

তবুও দূরে সরে গিয়ে তুমি

হারিয়ে যেতে চাও কি আত্ম-প্রশ্নে ঘুরে-ফিরে?" এখানের এই আত্ম-প্রশ্ন তো কবির নিজের চেতনার। আর ওই চেতনার পরিণতি ঘটছে চরিত্রে, সংলাপে।

তাহলে কবি তার চেতনা, অবচেতনাকে চরিত্রের চেহারা দিচ্ছেন সংলাপ বসিয়ে। তাতে কবিতায় বৈচিত্র্য যেমন আসছে তেমনি সংলাপ বিনিময়ে তা হয়ে উঠছে বিশ্বাসযোগ্য। 'আমার এ ছোটো মেয়ে' কবিতায় যে মেয়েটি বিছানায় শুয়ে আছে সে তো 'মৃত মেয়ে।' তবুও তার পুরনো কথা, তার অন্তরের কথা কবির বাচনভঙ্গিতে তাকে চরিত্রের রূপ দিল। সেও বলে উঠল কথা— 'ব্যাথা পাও? কবে আমি মরে গেছি— আজও মনে কর?' এই উক্তি সেই মেয়েটির কথা যাকে কবি আজও ভুলতে পারেন নি। জীবিত কালে সে কবির প্রাণের প্রিয় ছিল, কেননা সে ছোট্ট। তাকে জীবন্ত করা হল সংলাপ বসিয়ে। কিন্তু একেবারে শেষে জানতে পারলাম ওটা কবির মৃত্যুভীতি, মেয়েটি কিন্তু বাস্তবে জীবিত— 'কখন উঠেছে ডেকে দাঁড়কাক— / চেয়ে দেখি ছোটো মেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে খেলে— আর কেউ নাই।' এভাবে সংলাপ না দিলে বক্তব্য এত বেশী প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত না। মেয়েটিও কবিতার মাঝে জ্যান্ত হয়ে উঠত না। কবির অনুভূতিও মর্মন্তুদ হয়ে উঠত না। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় সংলাপ এনেছিলেন সচেতন হয়ে। তাঁর চেতনালোককে বাস্তবমুখী করে তুলতে। সেকারণে বৈতরণীর পারে দেখা শকুনরাও বলে গেল বাস্তব জীবনের কথা— 'কোথায় যেতেছ তুমি? পৃথিবীতে? সেইখানে কে আছে তোমার?' (কী যেন কখন আমি অন্ধকারে) কখনও এই সংলাপে হাজির হচ্ছে কবির মানবীরা। তারা এখানে কেউ বনলতা বা অরুণিমা নামে আসছে, আসছে নামহীন চরিত্র হয়ে। অথচ সংলাপে অংশ নিয়ে তারা যেন রক্তমাংসের মানবী হয়ে উঠছে—

" 'উষ্ণতা নেইকো চোখে— শান্ত আলো— দু'একটা ঝরা পাতা আধো-খসা বিনুনির 'পরে

পড়ে আছে—

আমাকে সে : 'চলো ঐ ভরা ঘাসে ঐখানে প্রান্তরের পথে;" (এখন এ পৃথিবীর) এই নারী আরেক রূপ নিয়ে জেগে উঠল 'পরস্পর' কবিতায়। সেখানের সংলাপে কবি আশ্রয় নিলেন রূপকথার। সেখানে রূপকথার নারীরা নানা উপমায় জেগে উঠল। রূপকথার আশ্রয়ে গল্প বলার আদলে চলতে থাকল সংলাপ। যে বর্ণনা দেওয়া হল সেখানে ছবির মতো সত্যবত মনে হল সেই নারীকে— 'দেখে না অনেকে

এই ছবি!' এখানের কবিতায় যে বিভিন্ন জনের সংলাপ বিনিময় হল তারা হল কবি, কুমার, আর-একজন। সংলাপের বাক্যজালে কবি নিজেই যেন সেই তিনটি চরিত্রের রূপ নিলেন। কেননা সব কথা বর্ণনা কবির নিজের। অতীত ও বর্তমান বীক্ষার— 'দিন যায় তাহাদের অসাধে,— অসুখে!— / দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ, / চোখে ঠোঁটে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ!' এই সুন্দরী আসলে একালের মেয়েদেরও ছবি। কেননা শুধু অতীতের দেবতা গন্ধর্ব নয়, একালের মানুষেরা পশুর মতো 'লয় শুষে'।

জীবনানন্দ সংলাপ সৃজন করে কবিতায় চিত্রকল্পও রচনা করেছেন। কথার আদান প্রদানে এসেছে প্রকৃতির রূপ। প্রকৃতিকে আশ্রয় করে জীবনানন্দ তাঁর ভাবনার বিস্তার ঘটান। প্রকৃতি একটি প্রধান চরিত্র তাঁর কবিতার। সংলাপ সেই পৃথিবীর গতি প্রকৃতি তুলতে গিয়ে সৃজন করছে চিত্রকল্প। 'দুজন' কবিতায় নিজেদের বিচ্ছিন্নতাকে তুলে ধরা হলেও সেখানে জীবন আর প্রকৃতিকে এক করে গড়া হল চিত্রকল্প। সেখানে নারী তার সঙ্গীকে যে হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করলেন তারপরেই এল চিত্রকল্প। যা সংলাপকে প্রতিষ্ঠা করল—

"এই বলে ম্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে

উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।

হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়

চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে-ছেনে যেতেছে শরীর ;

চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—" (দুজন) বর্ণনা ও সংলাপের সমানুপাত ব্যবহার আছে এখানে। তিন স্তবকের সংলাপ ও তিন স্তবকের বিবরণ দুজন-কে পাশাপাশি নিয়ে এল। মিশে গেল প্রকৃতি। 'তুমি' কবিতায় প্রকৃতির কোলে রাখা থাকল সংলাপ। কবি কেন এরকম সংলাপ ব্যবহার করছেন? কবিতাকে স্বয়ংক্রিয় করে তুলতে? কবিতার যে বক্তব্য তাকে কি একটু গতিশীল করার প্রবণতা? সংলাপে আমরা একটু গতিউষ্ণতা যেমন পাই তেমনি তা প্রত্যক্ষ বাস্তবমুখী ও আরও বিশ্বস্ত হয় যেন! জীবনানন্দের সে প্রয়াস কার্যকরী ছিল কিনা তার হদিশ পাওয়া যায় ওই সংলাপেই। 'বলিল অশ্বত্থ সেই' কবিতায় সেই গতি আছে। পঞ্চাশ বছরের মানুষের চলমানতার গতিরেখা সেখানে স্পষ্ট— 'পঞ্চাশ বছরও হায় হয়নিকো—এই-তো সেদিন .../ দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,— মনে হয় যেন সেই দিন!' বনলতা যখন বলেন 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' তখন বোঝা যায় ওই ক্ষুদ্র সংলাপ বহু বহু দিনের অপেক্ষার কথা বলছে। বহুদিন ওখানে ডুবে আছে। শুধু তাই নয়, আমাদের মনে হয় জীবনানন্দের কবিতায় যে সংলাপ তা থেকে কবির একার নয়, সেখানে অন্যান্য চরিত্ররাও উপস্থিত হয়েছে। কখনও তারা প্রত্যক্ষ কখনও কবির কণ্ঠস্বরে বিলীন। তাঁর কবিতায় সংলাপ আছে বলে, সেখানে একটা নাট্যাভাস আমাদের ভাবিয়ে তোলে। তাঁর সংলাপ কবিতাগুলি যদি গভীর অনুধ্যানে পাঠ করা যায়, তাহলে সেখানের নাট্যধর্মিতা সহজেই ধরা পড়ে। যেমন 'কনভেনশন' কবিতাটি। এখানে ছয় জন বক্তা চরিত্র হয়ে উঠে এল। প্রত্যেকে তাদের মতামত বক্তব্য বিস্তৃত করেছে। শেষে পঞ্চম বক্তার অতিরিক্ত বক্তব্য রেখে কবিতার শেষ। ওটিকে কবি উপসংহার বলেছেন। এখানের যে সংলাপ সেগুলিকে নাট্যধর্ম প্রদান করা যেতে পারে। কনভেনশন কবিতায় নানাজনের মতবাদের একটা সিরিজ আছে। তাদের প্রত্যেকের অভিমতকে মঞ্চ উপযোগী

করে তোলা যেতে পারে। ইঙ্গিতবাহী প্রতীকধর্মী কথাগুলি ব্যঞ্জনা নিয়ে নাট্যরূপ লাভ করতে পারে। কিছুটা রূপক নাটক করে কবিতাটির নাট্যিক উপস্থাপনে, কথার স্রোত তুলে ধরতে পারে জগতের সাহিত্যিক চলাচল। ব্যঙ্গে বেবুনের মনীষীর জাতে ওঠা, বাকিটা বুঝিয়ে দেয়। প্রথম বক্তা যে সুরে কথা শুরু করলেন, দ্বিতীয় বক্তার কথায় সেসব বাছুরের ষাঁড়ে পরিণত হওয়া, মাথায় শিঙ গজানো প্রভৃতি সংলাপ নাটকটিকে জমিয়ে দিতে পারে। যদিও এখানে কাব্যের স্বর ধরে বক্তাদের সংলাপ উপস্থাপনে দক্ষতা থাকতে হবে। তৃতীয় বক্তার সংলাপ যখন এল সেখানে যারা সভাসমিতি কাউন্সিল গ্যালারিতে বক্তৃতা দিয়েছে তাদের 'কথা বলে— কথা বলে— কথা বলে—' অনেক সময় কেটেছে জানানো হল। কিন্তু সেখানে তৃতীয় বক্তা শেষ দুটি চরণে যা বলল তা তো নাটকে নিসে এল ব্যজস্তুতির প্রলেপ—

''আমদের চেয়ে ঢের হালুবালু ভালো জানে বলে

বেবুন চালাবে মাইক্রোফোন।'' এসব বক্তব্য সংলাপ আমাদের শ্রুতিবিশোধন ঘটায়। বর্তমানের সাহিত্য সাধনা শুধু নয়, সময়ের রাজনৈতিক বা সামাজিক পাণ্ডাদেরও মনে হয় এখানে গাঁথা হয়েছে। চতুর্থ বক্তা যখন মুখ খুললেন তখন সেটা বোঝা গেল। গরিলা বানাতে গিয়ে প্রকৃতি যাদের মানুষ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের সম্বন্ধে যা বলা হল— তা যেন কাবিতাটিকে আরও বাস্তব করে তুলল। হেঁয়ালি থাকলেও সেখানে আছে নাটকের উচ্চগ্রাম— তারা মদ পেলে খুশি হয়। ভাঁড়ের মতো রসিকতা করতে জানে। নারী হত্যা দালালের ঋণ শোধ করে। শান্তির দেবতাও এদের ভুল শোধরাতে পারে না। এটি যেন নাটকের কেন্দ্র। নাটকের কথাকে একেবারে পরিষ্কার করে তোলা। পঞ্চম বক্তার সংলাপে শিঙ প্রসঙ্গ, ষষ্ঠ বক্তার কথায় বাজার ব্যাঙ্কের তেজি-মন্দা, কাঁচা-পাকা মাল প্রভৃতি কথায় 'মুকুরের মতো মুখে চোখ চেয়ে' দেখা আছে। এ কি আমাদের প্রত্যেকের নিজে নিজেকে একটু বিচার করে দেখে নেওয়ার ইঙ্গিত। ব্যাঙ্গাত্মক বা প্রতীকি নাটকে তো এরকম করেই কথা বলা হয়। জীবনানন্দ কবিতার মধ্যে নাটকের সেই আভাস কিছুটা হলেও রেখেছেন। অবশেষে পঞ্চম বক্তা এলেন । বললেন — 'বর্তমান টপকায়ে / অতীতই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে;' একথার গভীরতা কাব্যনাট্যকে ব্যঙ্গাত্মক থেকে করে তুলল বিপর্যস্ত সময়ের কথা। গোটা কবিতাটিতে একটি বিদ্রুপের চোরা স্রোত বয়ে চলেছে। কবিতার মতো নাটকেরও এরকম একটা স্রোত থাকে, যা এখানে বহমান। চরিত্রের অবস্থান, সময়ের চলমানতা, বেবুন মনীষী, শান্তির দেবতা, বিপর্যস্ত পৃথিবী, দেবদূত ধর্মযাজক প্রভৃতি শব্দরা কবিতায় লুকানো অভিপ্রায়কে তুলে ধরছে। তাদের অবস্থান বলে দিচ্ছে সেখানে কবির অভীপ্সা। কবিতাটিতে ব্যবহৃত ধুঁয়াপদ সংগীতের একটা আবহ প্রস্তুত করতে পারে এখানে—

''আমাদের জাহাজের—উড়োজাহাজের

লস্কর ও মিস্ত্রিদের জ্ঞাপন করেছি ভালোবাসা।''

স্থান কাল সংলাপ চরিত্র বিষয় নিয়ে কবিতাটিকে একাঙ্ক নাটকে পরিণত করা যেতে পারে। ব্যঙ্গের কষাঘাত খেয়েও আমাদের কি বিবেক ব্যাথিত হবে না কবির নাট্যধর্মী সংলাপ পড়ে বা মঞ্চস্থ পাঠ শুনলে?

জীবনানন্দ তাঁর 'আমার জীবন ও কবিতা' প্রবন্ধে তাঁর নাটক লেখার প্রসঙ্গে বলছেন— ''না পারছি নাট্য-সমালোচকের নীতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ ক'রে তেমন কিছু নাটক লিখতে।'' অর্থাৎ নাটক লিখতে না পারার কিছুটা আক্ষেপ তাঁর ছিল। কবিতাগুলি যেন তাই বলছে।

‘মকরসংক্রান্তির রাতে’ কবিতায় ‘মহান তৃতীয় অঙ্কে : গর্ভাঙ্কে’ লুপ্ত হওয়ার কথা বলেছেন। অন্যান্য কবিতায় থাকছে ওই ‘তৃতীয় অঙ্ক’, ‘গর্ভাঙ্ক’— যা নাটকের ইঙ্গিতবাহী। তাঁর সংলাপ কবিতাগুলি কি নাটক না লিখতে পারার আক্ষেপকে কিছুটা মিটিয়েছিল? ‘এ ও সে’ কবিতার নির্মল সংলাপ কি নাটকের চেহারা নিতে পারে? বা আদৌ তাকে নাট্যরূপ দেওয়া যায়? কবিতাটিকে ধীর লয়ের, বোধের, ভাব বিনিময়ের, অভিব্যক্তি বিনিময়ের নাট্যাঙ্গিকে তুলে ধরা যেতে পারে। ‘এ ও সে’-এর সংলাপে সংলাপে কাব্যিক উচ্চারণ আমাদের মনে একটা আস্বাদ জাগিয়ে যায়। শীতের সকাল, নীল বই, মাখন তোলার শব্দ যেন প্রকৃতির রূপ ছবিকে তুলে ধরে। ‘সবুজ চোখের স্বপ্নে’ কবিতার কথা কাব্যনাট্য হয়ে ওঠে। তৃপ্তি পাওয়া যায় এসব সংলাপ শুনে। কেও কোথাও নেই। যেন এ ও সে মাত্র দুটি চরিত্র নিজেদের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকে। ‘শীতের সকালবেলা রোদের ভিতর’ সেই কথকতা শুরু হয়ে পৌঁছে যায় সন্ধ্যায়—

“যখন দু-চোখ তবু বুজে আসে সন্ধ্যায়,
আমার মাথার স্বপ্ন রূপার জালের মতো হয়ে
হাওড়ের অন্ধকার জলের উপর থেকে

ছায়া ধরে আপন!” কবিতাটিতে কোথাও কোনও নাট্যমুহূর্তের চড়াই উতরাই নেই। সরলরেখার মতো সহজ সরল সোজা সুন্দর। পরিপাটি জগতের ছবি তুলে ধরে সংলাপ যেন কুলুকুলু শব্দে বয়ে চলে কবিতা-নাটকের পদে পদে। এ ও সে-এর ভাবের আদান-প্রদানকে এই কবিতা স্বল্প দৈর্ঘ্যের নাট্যে উপস্থাপন করতে পারে। কেননা এই কবিতার হৃদয়গ্রাহী সংলাপ জগতের নাটক হয়ে উঠে আসতে চাইছে। তার সেই গঠনগত বা ভাবগত বৈশিষ্ঠ্য এখানে রাখা আছে। যা শুধু অনুভব যোগ্য—

“আজ তবু এখানেই আছে ;
তোমার হৃদয় থেকে হয়তো কাহারও হাত এসে
মেয়েমানুষের পেটে সন্তানের মতো

বাঁচায়ে রেখেছে তারে!” তবুও বলতে হয় কবিতাটিকে নাট্যে রূপান্তরিত করতে গেলে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কবিতায় ‘এ’ যখন তৃতীয় সংলাপটি বলে তখন ঠিক বোঝা যায় না সেখানের কোন সংলাপে ‘ও’-এর কথা ফুটে উঠছে। তবে চরণগুলির মধ্যস্থ স্পেশগুলি যদি সংলাপের অন্তর হিসাবে ধরে নিই, তাহলে সংলাপকে নাটকে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। আবার সংলাপ কবিতা ‘শিকার’কে আমরা যদি নাট্যগঠনে সাজাতে যাই তাহলে সেটা একটা রূপ নিতে পারে। তবে সেখানেও জীবনানন্দের সংলাপ রচনার ওই পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেখানে ‘আর জন’ এর সংলাপে ‘আর জন’ ও ‘এক জন’ মিশে যায়। যদি আমরা ‘আর জন’ শিকারির তৃতীয় সংলাপ দেখি, তাহলে দেখব ওখানে ওই দুজন শিকারির সংলাপ মিশে গেছে। তখন ওই চরণের অন্তরে স্পেশ দেখে কার কোনটা সংলাপ সেটা একটু অনুমান করে নিতে হয়। গোটা ‘শিকার’ নামক সংলাপ কবিতাটি আমরা যদি নাটকের আদলে দেখি তাহলেও

সেখানে কোন ঘনপিনদ্ধ ভাব গড়ে ওঠে না। হয় ভাসা ভাসা একটা বোধ উপলব্ধ হয়, নয়তো বা কিছুই পরিষ্কার হয়ে ওঠে না। জীবনানন্দের বহু চেতনার মিশ্রণে তাঁর কবিতার যে ঘরানা, সেই বহুমুখী বক্তব্য নিয়ে কবিতাটি নাটকের গায়ে মনস্তত্ত্বমূলক হয়ে ওঠে যেন—

"সেই জলে কার যেন মুখ ভেসে ওঠে!

চেয়ে দেখ,—

তবু তারে কোথাও কি দেখা যায়?"

'সে জাহাজ দেখেছে কি কেউ?' জীবনানন্দের আরেকটি দীর্ঘ সংলাপ কবিতা। কথার পর কথার ঢেউ এসে সবকিছু যেন ওলটপালক করে দেয়। কবি কেন চেতনায় এসব কথা তুলে ধরছেন তার হদিশ পাওয়া প্রায়ই যায় না। তবুও এখানে সংলাপ আছে। নাবিক ছাড়াও আরেকজন আছে, সর্বোপরি প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন কবি। চরণ স্তবক ও স্পেশগুলি ধরে ধরে কবিতাটিকে পড়া যায়। তবে কোনটা কার উক্তি সেটা মাঝে মাঝে কুয়াশাছন্ন হয়ে ওঠে। তবুও পাঠের পর পুনঃপাঠে কবিতাটিকে নাটকের পর্যায়ে দেখা যেতে পারে। যেখানে সমুদ্রযাত্রার নানা অভিজ্ঞতা, জীবনের পৃথিবীর মেয়েমানুষের কথা নিয়ে একটা গল্পও বলে যায়। তবে সবই আধো আধো। আর ওখানেই জীবনানন্দের কবিতা, জীবনতত্বের নানা কথা টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে রাখে কবিতায়। কবিতার কথাচলন নাটক হয়ে ওঠে যেন। এখানে তার কিছুটা আভাস আছে। অদ্ভূত হয়েও জীবনকে ছুঁয়ে যায় সেসব কবিতার কথা। জীবননাট্যের ধারাভাষ্য হয়ে সেসব কথা ঘোরাফেরা করে আমাদের মনের ভিতর। কখনও হয়ে ওঠে শ্রুতিনাটক—

"ঘুম নাকি সবচেয়ে ভালো?

তবুও ঘুমের থেকে ভালো এই জেগে থাকা,— এই জেগে থাকা!

আমরা বাঁচিয়া থাকি আমাদের হৃদয়ের দোষে,—

অবসাদ ধরে গেলে অবসন্ন হতে চাই আরও!" যদি কোনও চরিত্র কবিতার এই চরণগুলি মঞ্চে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করে তাহলে কি নাটকীয় একটা মুহূর্ত তৈরী হবে না? হয়তো হবে। হয়তো ওই হওয়াটাও জীবনানন্দের মনে নাটক লেখার সুপ্ত বাসনার বহিঃপ্রকাশ। যার কোনও প্রতিউত্তর আমরা জীবনানন্দ থেকে পাই না। শুধু তার কবিতা বলে দেয় সেখানে চিরাচরিত নাটকের একটা শ্রতিবিশোধন করার প্রয়াস থাকতে পারে—

'গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে-কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতি বিশোধন।' (পরিচায়ক) আবার 'সবারই হাতের কাজ' কবিতায় জীবনানন্দ বলছেন—

'নাট্যের লিখন তারা— তবু তারা পড়েছিল মৃগশিরা নক্ষত্রের নিচে,

কথোপকথন গান স্বগতোক্তি নেপথ্যের রব

শিশিরবিন্দুর মতো শব্দ করে দর্শকের কানে;’

শিবশঙ্কর পাল

লোকসংস্কৃতির নানা দিক অন্বেষণ ও প্রবন্ধের জগতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন লেখক। কবিতা লেখা ও বিভিন্ন কবির কবিসত্ত্বা বিশ্লেষণ তাঁর সাহিত্য সাধনার আরেক দিক।